সহাধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণামাতাজীর মহাপ্রয়াণ

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষা ও স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন উনিশ শতকের শেষের দিকে। সে-চিন্তার অঙ্কুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগৃহের আবেষ্টনীতেই জেগে ওঠে। গ্রামবাংলার পুরোনো পরিবেশেই ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান শিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী মেয়েরা। তাঁরা স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাপন করতে আগ্রহী হন ত্যাগের জীবন। এমনই এক সন্ন্যাসিনীর আদর্শ জীবনের অবতারণায় এই প্রসঙ্গ।

১৯২৮ সালের ২৯ জুন (১৪ আষাঢ়, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল ইলা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ভাদুড়া গ্রামে (ফলতা থেকে দু-তিন মাইল দূরে) ছিল তাঁর পৈতৃক নিবাস। গ্রামের সচ্ছল গৃহস্থ বিদ্যানুরাগী শশিভূষণ সামন্ত ছিলেন আদর্শবাদী শিক্ষক। গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করার ঐকান্তিক ইচ্ছায় তিনি ভাদুড়া হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে গ্রামসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বহু দুঃস্থ ছাত্রকে তিনি নিজের বাড়িতে রেখে নিখরচায় থাকা-খাওয়া এবং পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর অর্থেই স্কুলটি চলত। শশিভূষণের কনিষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রনাথ ছিলেন কলকাতার রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক। মণীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর আট পুত্র-কন্যার মধ্যে ইলা ছিলেন তৃতীয়।

মণীন্দ্রনাথ কলকাতায় নিজের খরচে একটি মেস খুলে বহু ছাত্র এবং শিক্ষককে বিনামূল্যে সেখানে থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার সুব্যবস্থা করে দেন। তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ সমাজসেবী। বহুজনকে অর্থসাহায্যও করতেন। ধর্মপ্রাণা মৃণালিনী দেবী পরিবার-পরিজনদের সেবায় সদা কর্মব্যস্ত থেকে উপযুক্ত সহধর্মিণীর কর্তব্য পালন করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা ও স্বামীজীর প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল।

ইলা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ভাদুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েন। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ে বালিকা বিভাগে অধ্যয়ন করেন। ইলার সময়ে তাঁদের বিদ্যালয়ের ছাত্রীবিভাগের সুনাম এবং গুণগত মান জাতীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল। শরীরচর্চা, এন সি সি, সাইক্লিং, গ্রামে গ্রামে গিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ানো, গ্রাম-সাফাই অভিযান—সববিষয়ে তাঁদের স্কুল অগ্রণী ছিল। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীরা নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলারক্ষা, সাংস্কৃতিক চর্চা প্রভৃতির পাঠগ্রহণ করত বিদ্যালয় থেকেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষাই ইলার জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

ইলার পিতা আশ্রমের মহারাজদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং সেখানকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। বিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠানে অন্যান্য আশ্রমের মহারাজরা আসতেন। তখন থেকেই ইলা তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হন। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় স্বামী প্রবোধানন্দজীকে (সনৎ মহারাজ) প্রথম দেখেন তিনি। মহারাজদের মনে মেয়েদের মঠ গঠনের অভিলাষ ছিল বলে, ভাল মেয়ে দেখলেই প্রবোধানন্দজী তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, ‘‘মামণি, সাধু হতে হবে।’’ সেইসঙ্গে স্বামীজীর বই এবং অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকও পড়তে দিতেন।

এছাড়াও সেখানে আসতেন স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ (প্রিয় মহারাজ), স্বামী ওঙ্কারানন্দ (অনঙ্গ মহারাজ), স্বামী গোবিন্দানন্দ (বলাই মহারাজ) প্রমুখ। এঁদের প্রেরণা ও স্নেহ কিশোরী ইলার মনে গভীর ছাপ ফেলে। ১৯৪৫ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ইলা আশাদিকে (প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণামাতাজী) সরিষা আশ্রমে পেয়েছিলেন। স্বামীজীর রচনাবলি, বিশেষ করে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' পাঠ করে আশাদির মনে সন্ন্যাস অবলম্বন করে স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য আগ্রহ জেগে উঠেছিল। ভাবী মঠের একটি পরিকল্পনা তখনই তাঁর মনে ছিল। ফলে তিনি ব্রহ্মচারিণী-জীবন যাপনে ইচ্ছুক কয়েকজন কিশোরীকে নিয়ে একটি আশ্রম গড়ে তুললেন উত্তর কলকাতার বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে। এটি ১৯৪৪ সালের ঘটনা। আশ্রমের নাম হল সারদা আশ্রম।

আশাদির প্রেরণায় ইলা সারদা আশ্রমে যোগ দেন। তখন তাঁর ছাত্রীজীবন। বিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চার প্রতি ছিল আশাদির অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ। আশ্রমে তিনি ছাত্রীদের জন্য শাস্ত্রচর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল না হলেও পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াবার ব্যবস্থাও ছিল। এইভাবে ইলার জীবনে শাস্ত্রচর্চা এবং পড়াশোনার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে ওঠে। এই সময় ইলা সহ অনেকে লঘুকৌমুদীর পরীক্ষা দেন। আশ্রমবাসিনীরা পরে স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, তাঁদের মধ্যে ইলাই ছিলেন সবচেয়ে মেধাবী ও বুদ্ধিমতী। তিনি তদানীন্তন উইমেন্স কলেজ থেকে এফ এ এবং পরে ১৯৪৮ সালে বি এ পাশ করেন।

১৯৫০ সালের ৩০ জুলাই আশা দেবীর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে, পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের ব্যবস্থাপনায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত নিবেদিতা স্কুলে সারদা আশ্রমের সদস্যাদের সঙ্গে ইলাও নিঃস্বার্থ কর্মী হিসাবে নিঃশর্তে যোগদান করেন। এরপর থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর তিনি স্কুলের কাজে যুক্ত থাকেন।

ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে ইলা মঠে বাস করার সুযোগ পান। সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছে বেলুড় মঠে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন তিনি। এরপর দুবছর নিবেদিতা স্কুলে এবং একবছর সি. আই. টি রোড-স্থিত এন্টালি রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রমে থেকে আবার স্কুলে ফিরে আসেন। ১৯৬০ সালের ১০ ডিসেম্বর শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীর কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। নাম হয় প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা।

প্রথমদিকে নিবেদিতা স্কুলে বিশ্বপ্রাণামাতাজী বেশ কয়েক বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগে ক্লাস নিয়েছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদিকা নিযুক্ত হন।

বিদ্যালয় পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধা ও খুঁটিনাটি সব ব্যাপারে তিনি শুধু দৃষ্টিই রাখতেন না, এগিয়ে এসে দায়িত্ব নেওয়া ও সাহায্য করা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। দীর্ঘদিন তিনি স্কুলের হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ম্যানেজিং কমিটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

জপধ্যানের মতোই কাজ ছিল তাঁর সাধনার অঙ্গ। প্রতিপদেই দেখা যেত তাঁর সাধুজীবন ও কর্মজীবন এক সমান্তরাল রেখায় চলেছে। কর্মব্যস্ততার দিনগুলিতেও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধ্যায় ও জপধ্যান করতেন। সেইসঙ্গে ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও ধারণাশক্তি। যে-কোনও ছোট-বড় সমস্যায় তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন এবং সহৃদয় সাহায্য করতেন। আশ্রমে তিনি সকলের পরম ভরসাস্থল ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে কঠোর মনে হলেও, তাঁর মনে সবসময় কল্যাণেচ্ছা ফল্গুনদীর মতো বয়ে যেত। নিবেদিতা স্কুলের দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর অন্তরের স্নেহ সকলেই অনুভব করত। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই এগিয়ে আসতেন, লৌকিকতার অপেক্ষা করতেন না। হয়তো ঠাকুরঘরের রুটিন যাঁর, তাঁর কাছে পাহাড়প্রমাণ পরীক্ষার খাতা জমে রয়েছে এবং নম্বর জমা দেওয়ার সময়ও নিকটবর্তী। ঠাকুরঘরে এসে মাতাজী সেই ভগিনীকে বললেন : ''আমি ঠাকুরঘর করব।''

তাঁর সেই ঘোষণার মধ্যে এমন কিছু থাকত যা উল্লঙ্ঘন করা চলত না। তিনি সবরকম কাজই প্রয়োজনে করতে পারতেন এবং কাজও ছিল নিখুঁত। তাঁর কথাবার্তা ও নির্দেশ সবসময় ইতিবাচক ছিল। 'এটা করবে না' না বলে, বলে দিতেন কী করতে হবে। বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ উৎসবে ছাত্রীরা যে-নাটক মঞ্চস্থ করত, তার নির্দেশনার কাজ তিনি করতেন অতি নিখুঁতভাবে। তাঁর নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি, মার্জিত রুচি সবদিকে একটি সুচারু ছাপ রেখে যেত।

মাতাজী খুব নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। মঙ্গলারতিতে যাওয়া কোনওদিন বাদ পড়েনি। তাঁর সময়ানুবর্তিতা দেখে সকলেই অবাক হত। বলতে গেলে তাঁকে দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া যেত।

মাতাজী স্বল্পভাষী ও গম্ভীর স্বভাবের ছিলেন। আপনমনে থাকতেই ভালবাসতেন। অনেকের তাঁকে দেখে মনে পড়ত কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—''আত্মারাম! সিংহ একলা থাকতে, একলা বেড়াতে ভালবাসে! অনপেক্ষ!'' তাঁকে দূর থেকে লক্ষ করলেও মনে শ্রদ্ধা জাগত। কিন্তু এমনও নয় যে তাঁর দিকে এগোনো যেত না।

নিবেদিতা স্কুলে যোগদানের সময় তাঁকে যে-ছাত্রীরা দেখেছেন তাঁরা স্মৃতিচারণ করে বলেন, ইলাদির সংযত আচরণ, মধুর ব্যক্তিত্ব ও কোমল ব্যবহারে তাঁরা আকৃষ্ট হতেন। বিশেষত চোখে পড়ত তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়ী চলাফেরা ও সর্বদা একটি শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাব। অসাধারণ শিল্পবোধ ছিল তাঁর। ফুলদানিতে ফুল সাজানো এবং সরস্বতীপূজা প্রভৃতি উৎসবের দিনে বিবিধ সজ্জাশৈলী দেখে সকলেই মুগ্ধ হতেন। আশ্রমের প্রতিটি রীতি—তা সে কোনও কার্যক্রম বা গান বা যাই হোক না কোন, সেটিকে নিখুঁত করবার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত।

মাতাজীর আচার-ব্যবহারে সংযম ছিল লক্ষণীয়। যেমন আচরণে, তেমনি ভোজনেও। স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় প্রায় সারা জীবন নির্বিকারভাবে সাদামাটা ঝোলভাত পথ্য খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। ব্যবহার করতেন খুব পরিমিত জিনিস, সেইসঙ্গে ছিল ব্যবহার্য দ্রব্যের প্রতি যত্ন।

মাতাজীর চরিত্র ছিল ঋজু। জনৈকা প্রাচীন সন্ন্যাসিনী তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, ''ইনি এমন এক সাধু যিনি হাঁটেন সোজা, ভাবেন সোজা, বলেন সোজা, করেন সোজা।'' বাস্তবিকই তাঁর মন-মুখ এক ছিল। তাঁর চরিত্রে এমন একটা তেজ ও দৃঢ়তা ছিল যা সহজে লঙ্ঘন করা যেত না। তাঁর আবেগ খুবই সংযত ছিল, কিন্তু তাঁর স্নেহ ও বিশ্বাস অনুভব করা যেত।

উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তিনি যথেষ্ট কাজ করেছেন, তবুও অতিরিক্ত কাজের বাড়াবাড়ি তাঁর একেবারেই মনোমতো ছিল না, সবদিক বজায় রেখে নিজের ক্ষমতা বুঝে কাজ বাড়াতে বলতেন। সহজ সোজা মানুষটি চিরদিন মাথা উঁচু করেই বেঁচেছেন। অথচ সঙ্ঘের কোনও সমস্যার সমাধানে কত অনায়াসে সে-মাথা নোয়াতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। অন্যের ভুল সামলাতে, পরিস্থিতির প্রয়োজনে তিনি যে-কোনও কর্মীর কাছে ক্ষমা চাইতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এমনই ছিল তাঁর অভিমানশূন্যতা এবং সঙ্ঘসচেতনতা।

মাতাজীর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ। তাঁর সান্নিধ্য খুব বেশি পাননি বলে তাঁর মনে দুঃখ ছিল। পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের সঙ্গলাভ করে তাঁর সে-অভাব পূর্ণ হয়। তিনি মহারাজের প্রতিটি কথা ডায়েরিতে লিখে মনন করতেন এবং সেই অনুসারে জীবন পরিচালনা করতেন। তাঁর লিখিত 'সাধুসঙ্গে পুণ্যকথা' বইটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই উপকৃত হয়েছেন নানাভাবে।

১৯৯৬-৯৭ সালে বছর খানেকের জন্য ভুবনেশ্বর শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষাপদে নিয়োজিত থেকে বিশ্বপ্রাণামাতাজী পুনরায় নিবেদিতা স্কুলে ফিরে আসেন। ২০০৯ সালে তিনি ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট পদে বৃত হন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত ওই দায়িত্ব পালন করেন। মাঝে ২০০৬ সালে সিরিটি কেন্দ্রে চার বছর

ছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অছি পরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হন। অছি পরিষদের নির্দেশে ২০১১ সাল থেকে তিনি বহু অধ্যাত্মপিপাসুকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেন। তাঁর দীক্ষিত সন্তানের সংখ্যা ছশো একাত্তর। ২০১২ সালে তিনি শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সহাধ্যক্ষা পদে বৃত হন।

তিনি স্বভাবত একটি অত্যন্ত নিয়মবদ্ধ জীবন যাপন করতেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর বহির্জগৎ থেকে মন গুটিয়ে ঠাকুরঘরে প্রায় চোদ্দো-পনেরো ঘণ্টা বসে প্রশান্তমুখে গভীর জপধ্যান করতেন। আর ছিল তাঁর অত্যন্ত নিঃস্পৃহ ভাব। শেষের দিনগুলিতে প্রায়ই বলতেন : ''আমার তো এখানে আর থাকার কথা ছিল না—আমার তো এখন রামকৃষ্ণলোকে থাকার কথা। অপেক্ষা করে বসে আছি কখন শ্রীশ্রীঠাকুর নিতে আসবেন।''

তাঁর কাছে যাঁরা দীক্ষা লাভ করতেন সকলের কথা তিনি ধৈর্য ধরে শুনতেন, খবর নিতেন এবং প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন। এতদিন সঙ্ঘের সকল সদস্যার প্রতি তাঁর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এখন শিষ্যদের প্রতিও সেই দরদ, মহানুভবতা, ভালবাসা সমানভাবেই প্রকাশিত হতে লাগল।

শেষ জীবন পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের প্রতিটি খবর তিনি আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন এবং সে-ব্যাপারে খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন। স্কুলের উঠোনে কোনও অনুষ্ঠান হলে ছাত্রীদের বসা এবং রোদ নিবারণের জন্য মাথার উপরে আচ্ছাদন দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরই উদ্যোগ থাকত সর্বাধিক। আগে কয়েকদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করতেন রোদ কোনদিকে পড়ছে, কোথায় বসলে ছাত্রীদের কষ্ট হবে না। প্রতিটি অনুষ্ঠানের স্টেজ রিহার্সাল খুঁটিয়ে দেখতেন ও প্রয়োজনে সংশোধন ও মন্তব্য করতেন। বিদ্যালয়ে বাৎসরিক উৎসব ও পূজা, জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা প্রভৃতি সবগুলিতেই তাঁর সজাগ তত্ত্বাবধান ছিল। কখনও কখনও পাঠ করে সকলকে আনন্দ দিতেন। কণ্ঠ ছিল মধুর, পঠনভঙ্গি সুললিত। তিনি বহু বছর রথের দিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেছেন।

২০১৪ সালে মাতাজী দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হন। সুচিকিৎসার মাধ্যমে দ্রুত আরোগ্যলাভ করেন। প্রথম যখন জানা গেল তাঁর অসুখের কথা, সকলের খুব মন খারাপ। কিন্তু মাতাজী নির্বিকার, সহজ, স্বাভাবিক। চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে ফিরেই দীর্ঘদিনের সঙ্গী, বিদ্যালয়ের বর্তমান সম্পাদিকাকে খুব সহজ স্বরে বললেন, ''শুনেছ তো, আমার ক্যানসার হয়েছে?'' যেন আর পাঁচটা অতি তুচ্ছ ঘটনার মতো একটি ঘটনা। সারদা মঠ থেকে মাতাজীরা তাঁকে দেখতে এলে নিজের শরীরের একটাও কথা না বলে, পুরনো দিনের একটার পর একটা ঘটনা বর্ণনা করে আনন্দের হাট বসিয়ে দিলেন। মাতাজীর তখন পঁচাশি বছর বয়স। অথচ সব চুল কালো। মাতাজীদের কী সম্বোধন করতে হবে জানা না থাকায় একজন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন : ''ম্যাডাম আপনার বয়স কত?'' উত্তর শুনে বিস্মিত ডাক্তারবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল—''রিয়েলি? আপনি কি চুলে কলপ করেছেন?'' এই কথাটি মাতাজী সেদিন সরস ভঙ্গিতে এমনভাবে সকলকে শোনাচ্ছিলেন যে সকলে হেসে কুটোপাটি। মাতাজীর রসবোধ ছিল অসাধারণ। মজার কথা মজা করে বলতে-শুনতে এবং অকৃত্রিম হাসি হেসে উপভোগ করতে পারতেন।

২০১৬ সালের দুর্গাপূজার সময় তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। একমাস হসপিটালে থেকে ফিরে আসেন। ডাক্তারের আর কিছু করার ছিল না। শেষ একমাস নীরবে তিনি অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেন। ৩ ডিসেম্বর ২০১৬ শনিবার রাত্রি ৮.৪০ মিনিটে বহু সন্ন্যাসিনী, ব্রহ্মচারিণী, শিষ্যা ও ভক্তপরিবৃত হয়ে শ্রীভগবানের বন্দনামুখর এক দিব্য পরিবেশে পরমপূজনীয়া বিশ্বপ্রাণামাতাজী রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে সমর্পিত একটি মহাজীবনের অবসান ঘটল। পরবর্তীদের সামনে রইল সাধুজীবনের অমূল্য দৃষ্টান্ত। বরণীয় সেই সন্ন্যাসিনীর চরণে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি।